The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

# শিক্ষায় স্বাদেশিকতা এবং আল মাহমুদের কবিতা পাঠদানে স্বাদেশিকতার প্রতিফলন

## [Nationalism in Education and the Reflection of Nationalism in Teaching Al Mahmud's Poems]

Dr. Fazlul Haque Tuhin
Lecturer (Demonstration Unit), Rajshahi University School, Rajshahi, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 26 February
Received in revised: 16 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Teaching, Education, Padagogy, Nationalism, Al Mahmud's Poems

**ABSTRACT**

This study examines the integration of nationalism into education through the teaching of Al Mahmud's poetry, with a focus on exploring how his works reflect the essence of nationalism and its relevance in shaping responsible citizens of Bangladesh. The primary objective of this research is to analyze the role of Al Mahmud's poetry in fostering patriotism and a sense of national identity among students, particularly in the context of modern education. As one of Bangladesh's most celebrated poets, Al Mahmud's poetry captures the struggles of the nationalist movement, the liberation war, and the socio-political transformations of post-independence Bangladesh, making it an invaluable medium for nurturing a sense of belonging and commitment to the homeland. This study highlights how his vivid depictions of rural Bengal, its river-centric life, cultural heritage, and natural beauty stand in stark contrast to the alienation of urban existence, providing a framework for students to engage with their roots. Furthermore, it emphasizes that in the modern era of globalization, neo-imperialism, and cultural disintegration, addressing nationalism in education becomes a critical means of preserving cultural identity and resisting foreign hegemonies. By revisiting the concept of nationalism, which has evolved through history and gained multidimensional significance in modern poetry, this research underscores the importance of teaching Al Mahmud's works to inspire students with patriotic values and national consciousness. The study concludes that integrating his poetry into the curriculum can effectively counteract cultural erosion while fostering an enduring connection to Bangladesh's heritage and collective identity.

### ভূমিকা

যে কোনো বিদ্যাশিক্ষায় (Pedagogy) স্বাদেশিকতা (Nationalism) গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্য বা কবিতা পাঠদান (Teaching) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে সেটাই তার স্বদেশ। ক্রমে এই দেশ হয়ে ওঠে তার কৈশোর, যৌবন ও পৌড়ত্বের আশ্রয়ভূমি। এখানেই তার শরীর ও মানস গঠনের ধারাবাহিক পর্যায় অতিবাহিত হয়, সেজন্যে চারপাশের বস্তুপুঞ্জ ও পরিবেশের সাথে গড়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মায়ের সাথে সন্তানের নাড়ির যোগসূত্রের মতোই। মানুষের চিন্তা-চৈতন্য-আবেগ-স্বপ্ন ও কর্মের প্রকাশ ও বিকাশে স্বদেশ কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কারণে স্বদেশের প্রতি এক ধরনের অনুভূতি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে বর্তমান।

### শিক্ষায় স্বাদেশিকতা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় (Education System) স্বদেশ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। স্বদেশের জনসাধারণকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিকযুগে স্বাদেশিকতা (Nationalism) ধারণাটি যে অর্থে ব্যবহৃত, অতীত ও মধ্যযুগে সেভাবে চিহ্নিত হতো না। স্বদেশ, স্বদেশের প্রকৃতি, মানুষ, বস্তুপুঞ্জ, পতিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য; এককথায় সামূহিক অস্তিত্ব একজন আধুনিক মানুষের কাছে আলাদা এক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। জীবনযাপনে, সৃষ্টিশীলতায়, চিন্তা-চেতনায় ও ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশ কোনো না কোনো ভাবে ছায়াপাত করে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনার কালে এই চেতনা অত্যন্ত কার্যকর; কখনো তা ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করে। শিল্পসাহিত্যে অনিবার্যরূপে তার প্রতিফলন ঘটে। কবিতায় স্বাদেশিকতার রূপায়ণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কেননা মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা ও অনুভূতির প্রবাহ একজন কবির চৈতন্যে কবিজীবনের কোনো না কোনো সময়ে ঢেউ তোলে। তবে স্বদেশচেতনার ধারণা আধুনিক কবিতায় যে-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় সেভাবে রূপায়িত হয়নি। আধুনিক কবিতায়

স্বাদেশিক বোধ আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহে সৃষ্টি। কোনো জাতির জীবনে যখন নতুন আদর্শ বা চেতনার উদ্বোধন ঘটে, অন্য কোনো দেশ বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন আসে, স্বাধীনতা ও সার্বোভৌমত্বের সংকট দেখা দেয়, আবার লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়; তখন জন্মভূমি বা স্বদেশ সেই জাতির কবিতায় নবচেতনার সৃষ্টি করে এবং নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়। অন্যদিকে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে কোনো দেশ নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে উন্মূল হয়ে যায়, তখন সেই দেশের কবি-শিল্পীদের চেতনায় স্বদেশ-অন্বেষণ বা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তাড়না জন্মে। ১৯৫২ থেকে ৭১ পর্যন্ত সংঘটিত স্বাধিকার আন্দোলন-মুক্তিসংগ্রাম-গণঅভ্যুত্থান-মুক্তিযুদ্ধ দেশপ্রেমের কবিতাকে দিয়েছে বিচিত্র-বিস্তৃত-গভীর এক তাৎপর্য ও মর্যাদা। অতএব বিদ্যাশিক্ষায় (Pedagogy) স্বাদেশিকতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আল মাহমুদের কবিতাপাঠে স্বাদেশিকতার প্রতিফলন অনুসন্ধানের বিষয়।

**আল মাহমুদের কবিতা পাঠদানে স্বাদেশিকতার প্রতিফলন**

নদীমাতৃক ও গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশ আল মাহমুদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ও স্বদেশ। এই জনপদের প্রকৃতি মানুষ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিবাহী চেতনাপুঞ্জ তাঁর কবিতায় কাব্যাদর্শে প্রাণবন্ত। নগরের অবক্ষয়প্রাপ্ত, গ্লানিময় অনিকেত জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন স্বদেশের বিশাল পটভূমিকায়। স্বদেশ চেতনার রূপায়ণে এই ধারার অগ্রজ কবিদের কাব্যজগৎ তাকে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:

> আমি আমার কথা বলতে পারি যে, আমি সোজাসুজি আমাদের গ্রাম জনপদে ফিরে এসেছি। এবং পরীক্ষা করেছি যারা আমার আগে গ্রাম জনপদ, আমাদের দেশকে, আমাদের নদী-নালা, আমাদের ফোক, এগুলোকে যারা কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তাদের কবিতা কেমন? এটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি জসীমউদ্‌দীনের কবিতা, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, রবীন্দ্রনাথও পড়েছি। জসিমউদ্‌দীনের কবিতায় দেশের যে চিত্রগুলো এসেছে সেগুলো গাঁথা কাব্য থেকে। ... আধুনিক আঙ্গিকে গ্রামকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়তো বা আমিই সর্বপ্রথম করেছি। হয়তো বা কেন আমিই করেছি। একটি আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে গ্রামকে বাঙালী মুসলমান চাষীদেরকে, তাদের লেনদেন, তাদের যে আত্মীয়তার সূত্র- দেশের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি তাদের যে বন্ধন, তাদের যে দুঃখ বেদনা, সেটা আমি আমার কবিতায় আনার প্রথম চেষ্টা করেছি।[১]

আল মাহমুদ যে বাংলাদেশের ছবি আঁকেন তা রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-জসীমউদ্‌দীন অঙ্কিত নয়; নদীভাঙা গ্রামজনপদের জীবন ও সংস্কৃতির মিশেলে সেই ছবি তাঁর কবিতায় প্রথম বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষ্য:

> আমি এমন এক গ্রাম বাংলাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যে গ্রামবাংলা ভেঙে পড়া। ঠিক জসীমউদ্‌দীনের বাংলাদেশও না। আবার জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশও না। জসীমউদ্‌দীন এবং জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশে এক ধরনের রূপকথা আছে। একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু আমার দেখা বাংলাদেশ একদমই রূঢ়। এ বাংলাদেশ নদীর পাড়ভাঙা বাংলাদেশ। গ্রামকে গ্রাম বিলীন হওয়া বাংলাদেশ। এগুলো আমার কবিতায় প্রথম এসে যায়।[২]

কবি বাস্তব দৃষ্টিতে এবং স্বকীয় আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ স্বদেশের চিত্রাবলি ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। স্বাদেশিকতা বা স্বদেশচেতনা আল মাহমুদের কবিতার বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক গ্রামজনপদ; গ্রামজনপদে প্রত্যাবর্তন এবং দেশজননীর কল্পচিত্র নির্মাণ; দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্রোহী দেশচেতনা এবং নারীপ্রেম ও দেশপ্রেমের অন্বয়; তৃতীয় পর্যায়েও দেশজননীর ধারণা প্রকাশ পেয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাছে আত্মনিবেদনের আন্তরিক মনোভাব প্রকাশিত।

**ক**

স্বদেশ, স্বদেশের রূপ ও চেতনার উপকরণ, দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রভাব ও প্রতিফলন, ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও বস্তুগত জীবনের অত্যাবশ্যক খুঁটিনাটি এবং সর্বোপরি মৌলিক গ্রামীণ বাংলার ভেতরদেশ থেকে আল মাহমুদ কবিতা সৃজন করেন। তাঁর দৃষ্টি অনিবার্যভাবে গ্রাম-বাংলার দিকে ধাবিত; গভীর সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে সেইখানে মগ্ন ও সংলগ্ন এবং আত্মপরিচয়ের ঠিকানায় শেকড় প্রোথিত। দেশজ জীবন ও প্রকৃতির মাঝেই তাঁর জীবনবেদ ও নিষ্ঠাবান কাব্যবিশ্বাস উপস্থাপন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, গ্রামের কথকতার অর্থ গ্রাম্যতা নয়; সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশকে ভালোবাসা একজন কবির জন্যে অপরিহার্য শর্ত। তবে তিনি গ্রাম বলতে বোঝেন–

> আমি আমার কবিতায়, আধুনিক নগর সভ্যতা তথা সর্বব্যাপী নাগরিক উৎক্ষেপের যুগেও ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ জীবন ও ধসেপড়া গ্রামকে উত্থাপন করতে চাইছি বলে অনেক সমালোচক কটাক্ষ করেন। আমি তাঁদের বহুবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, গ্রাম বলতে আমি যূথবদ্ধ আদিম মানবজীবনকে বুঝি না, বরং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যে সব নরনারী ধনতান্ত্রিক নগর সভ্যতার বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলছেন তাঁরা আসলে গ্রামেরই লোক।[৩]

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাথে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন যে গ্রামীণ জীবনকাঠামো ও জীবন-সংস্কৃতি, নাগরিক জীবনাযাপনের জটিল ও কঠিন অভিজ্ঞতার মাঝে বসে আল মাহমুদ তাকেই লালন করেছেন চেতনার উজ্জ্বলতায়।

নাগরিকতার বিপরীতে তাঁর কবিতার ভিত্তি ও উৎস গ্রামের চাষা-চাষী, জমিন, বলদ-লাঙল, নদী, নদীর মাঝি-নৌকা, পাখি, রাস্তার ভবঘুরে ও ঘরনী। এইসব উৎস-উপাদান বাংলার গ্রামজনপদ থেকে গৃহিত যা স্বাদেশিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

যদি যান,
কাউতলী রেলব্রিজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ি।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।
দেখবেন, লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্তনীল শাড়ির নিশেন।
শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ।
দেখবেন ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে
আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী
এক ম্লান দুঃখের করবী।
['রাস্তা', *লোক লোকান্তর*]

আল মাহমুদের কবিতায় যে গ্রামের চিত্র প্রতিফলিত তা বাংলাদেশর প্রতিনিধিত্বশীল গ্রাম; তাঁর সেই আপন ছোট্ট গ্রামে সারা বাংলাদেশ ছায়া বিস্তার করেছে। কবির অন্তর্জগতে নদীময় ও কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ বাংলা ঢুকে তাকে পুরোপুরি অধিকার করে আছে। সেই বিম্বিত বাংলাদেশই তাঁর কবিতা।

আল মাহমুদের কবিতার চিরকালের অনন্য চরিত্র দেশজতা; তবে দেশজতা মানে কেবল মাটির আঘ্রাণ নয়, মানুষের প্রতিবিম্ব; যে মানুষ জমিনের সঙ্গে যুক্ত। জয়নুল আবেদীন ও এস এম সুলতানের ছবির মতো তাঁর কবিতায় এই জমিন ও মানুষ একই সূত্রেগাঁথা। যে জমিন তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাস থেকে এবং যে ভূগোল ও ইতিহাসের মধ্যে আছে কৃষকের সঙ্গে জমি, ধানক্ষেত, হালবলদ ও জমির দখলের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নিষ্ঠুর ও কর্কশ, আবার ভালোবাসার ও মমতার। কৃষক একদিকে লড়াকু হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে ধানগাছ, হালবলদ ও নারীর প্রেমিক। তিনি তাঁর কৃষক চতুষ্পার্শ্ব মিলিয়েছেন।[৪] কবি গ্রাম্য মোহনতা বা ভাবালুতা আক্রান্ত গ্রামীণ নিসর্গ আঁকা থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁর কাব্যে তাই কৃষক ও জমিন অর্জন করেছে একটি আবহমান বাস্তবতা ও বর্তমানতা। ইংরেজ-ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের দৃশ্যমান মদিরতা এবং নিরক্ত কাব্যিকতা থেকে তা স্বতন্ত্র। তিনি ভিন্ন শিল্পভুবনের অধিকারি– যেখানে কৃষক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং মনোভঙ্গির দিক থেকে বুর্জোয়া বিরোধী ও বিপরীত।

দ্যাখো, জয়নুলের ছবির মত ঘরবাড়ি, নারী
উঠোনে ঝড়ছে ধান, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি;
গতর উদোম করে হাতে লেপা মাটির চত্বরে
লাঞ্ছিত নিশেন হয়ে পড়ে আছে যেন অনাদরে।
['প্রত্যাবর্তন', *কালের কলস*]

অন্যদিকে স্বদেশের চিত্ররূপ আর কবিতাকে অভিন্নরূপে একই সমান্তরালে স্থাপন করেন। কেননা তাঁর কাছে স্বদেশের প্রকৃতি, মানুষ আর কবিতা একই বন্ধনে আবদ্ধ।

কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায় ঢাকা পথ, ভোরের আজান কিম্বা নাড়ার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ
মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর
বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর।
['কবিতা এমন', *সোনালি কাবিন*]

কবি উপনিবেশিক নিসর্গচিত্র (Landscape) অঙ্কন করেননি। উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে প্রকৃত দেশ, কৃষক-লাঙল-জমিন, নদী-মাছ-জাল, কর্ষণ-আবাদ-শস্যসহ কবি দেশের মাটিলগ্ন কর্মব্যস্ত মানুষের চিত্রাবলী আঁকেন; যার সঙ্গে জীবনবাস্তবতা জড়িত। গ্রামীণ প্রকৃতি এবং গ্রামের মানুষ নিয়ে কবির স্বদেশচেতনা কার্যকর।

নদী ভাঙনে বিলীন হওয়া বাংলাদেশের করুণ গাঁথা তাঁর কবিতাকে করেছে আরো জনমনস্পর্শী। নদী, নদীর ভাঙন, ভাঙনে বিলীন হওয়া গ্রাম, নদীলগ্ন প্রকৃতি-পশুপাখি ও মানুষ তাঁর কবিতার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। আজীবন নদীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর; জীবনের গভীর দুঃখময় অভিজ্ঞতা এই নদীর সঙ্গেই হয়েছে।

কেবল আমাকে নদীর কাছে যেতে বলতেন। বলতেন
জেনে আয় কোন দিকে চর পড়েছে।
আমি তার কথায় দৌড় দিতাম। কিন্তু ফিরে এসে বলতাম
আজ কৈবর্তপাড়ার নলিনীদের ভিটেবাড়ি ভাঙলো বাবা।
... তারপর ভাঙনের রেখা পেছনে রেখে
আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিতরে পড়লাম।
কেউ গেলাম মামুর বাড়িতে কেউ ফুপুর। যেমন
বাবেল থেকে মানুষের ধারা
ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।
['চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়', *সোনালি কাবিন*]

কবি আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়েই কবিতায় স্বদেশের গ্রাম, ভেঙেপড়া গ্রাম, গ্রামের নদীভাঙা পরিবার, পরিবারের সমুদয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া, ভাঙনের পারিবারিক পরিণতি, বিচ্ছিন্নতা ও আশ্রয়, চরের উত্থান-পতন, প্রকৃতি ও মানুষের প্রেম ও হিংসা, বহমান নদী ও নারীকে তুলে আনেন শহরের হাতছানি উপেক্ষা করে। তাঁর জবানবন্দী:

> কবিতার জন্যেই গ্রামে ও গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো। শহর থেকে শহরে, দেশ থেকে দেশান্তরে উড়াল। কবিতার জন্যই, বাংলাদেশের এমন কোনো নদী নেই যাতে আমি সাঁতার কাটিনি।[৫]

নদী, নদীতীরবর্তী জনপদ ও গ্রাম তাই তাঁর কবিতায় বিস্তৃত, প্রাণবন্ত ও মৌলিকতায় অনন্য। অনুকরণ ও কৃত্রিমতা একদম কাজ করেনি সেখানে।

আল মাহমুদ নগরবৈচিত্র্যের অন্তরালবর্তী এমন এক কবি, যাঁর চেতনায় জীবন্ত সত্তার মতো বিরাজমান বাংলাদেশের জনপদ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থতা ও বেদনার নিবিড় অনুষঙ্গ। নাগরিক ঐশ্বর্যের প্রাণহীন পটভূমিতে তিনি অনুভব করেন তিতাসের মায়াবী প্রাণ-স্পন্দন। আর লোকজ উৎসের আঘ্রাণে তাঁর শিল্পীমন ক্রমাগত স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।[৬] এই কারণেই কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে চান। যেমন বাংলাদেশের তিন খ্যাতিমান শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং সুলতানের অবদমিত কৃষকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন তিন পথ দিয়ে। জয়নুলের ক্ষেত্রে কৃষকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে লাঞ্ছনা ও দুর্গতির পথ দিয়ে; কামরুলের ক্ষেত্রে গ্রাম-বাংলার রাজনৈতিকতার পথ দিয়ে এবং সুলতানের কৃষকের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে।[৭] আসলে আল মাহমুদের মৌলিকতা ও নতুনত্ব গাঁয়ে অর্থাৎ স্বদেশে ফেরার পিপাসায় এবং অনিবার্য শব্দ-উপমা-চিত্রকল্পে সে পিপসার প্রকাশে। 'লোক লোকান্তরে'ই কবি শৈশব স্মৃতির সঙ্গী "তিতাসে"র কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। যেমন:

...শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস।
কী গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।
['তিতাস', *লোক লোকান্তর*]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত "কপোতাক্ষ নদ" কবিতায় শৈশবের নদীর দেশে, আবহমান বাঙালি অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনায় আকুল হয়ে নিজেকে স্মরণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। আল মাহমুদের যাত্রা তৃষ্ণাময় এক পথে; কিন্তু সঙ্গী ঐতিহ্যময় বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ আবহমান, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের সাথে সংলগ্ন, স্থানিক ও সংগ্রামী। প্রকৃতি ও মানুষের যূথবদ্ধ জীবনাচার ও জীবনাভিযানের লক্ষ্যে প্রত্যয়ী।

আমরা প্রতীকহীন হাতে কোন পতাকা নিইনি।
আমাদের সঙ্গে এক বাউলের বিধবা যাবেন

উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটি ছাড়া
তৃষ্ণার রাস্তায় আর অন্য কোন যুবতী যাবে না।
['জল দেখে ভয় লাগে', *কালের কলস*]

কবি নগরযন্ত্রণার উল্টোপথে তাঁর কাঙ্ক্ষিত জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন পুরোপুরি। ফলে তাঁর উদ্বেগ, সংশয় ও ভয় ক্রমাগত মুছে গেছে। কবি ফিরে এসেছেন গ্রামীণ জনপদে এবং আপন জীবন কাব্য পটভূমিতে। ধানক্ষেত, নদী-নালা, খালবিল-পাহাড় সমন্বিত যে লোকালয়, দুঃখের রাজত্ব যেখানে নিশ্চিত জেনেও কবি ফিরে এসেছেন:

দুঃখের রাজত্বে তবে পলাতক আমরা ক'জন
আবার এসেছি ফিরে; আমাদের ক্লান্তিহীন মন
একদিন জনপদ ছেড়ে এই ক্লান্ত কান্নাময়
পরিণাম চিন্তা করে দেশত্যাগী কবির হৃদয়
নিয়ে যেন পার হয়ে গিয়েছিলো নিজের এ কূল,
কিন্তু আজ মাছ পাখি নাও নদী মাটির পুতুল
বহমান মানুষের অনিবার্য প্রতীকের কাজে
আবার এসেছে ফিরে অনুতপ্ত, নিজের সমাজে।
['প্রত্যাবর্তন', *কালের কলস*]

কবির নিজের সমাজ স্বপ্ন আর মায়ায় আচ্ছন্ন নয়; একেবারে বাস্তব ও রূঢ়। শিল্পীর আঁকা কোনো নিসর্গচিত্র বা বোহেমিয়ান গ্রামীণ কল্পরাজ্যে কবির প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন এমন এক আধুনিক ঐতিহ্যে– যেখানে কৃষক ও প্রকৃতি বিদ্যমানতার মধ্যে জীবন্ত। জীবন ও জমিনের আবাদে ও বিবাদে বিকাশমান।

প্রাণের রঙের মত পরাজিত প্রেমের কেতন
আবার তুলতে চাই পলাতক আমরা ক'জন।
মানুষের বাসস্থান, লাউ মাচা, নীলাম্বরী নিয়ে
আমরা থাকতে চাই।
['প্রত্যাবর্তন', *কালের কলস*]

অনুতপ্ত ও প্রত্যাগত অনার্য বাঙালি কবি নতুন প্রত্যাশায় জীবনবাদী প্রেমের নিশান উড়াতে চান। কবি সেই গ্রামে থাকতে ইচ্ছুক, যে গ্রাম বা পল্লী শান্তি কিংবা স্বপ্নময় না হয়ে দুঃখ-বঞ্চনা-দারিদ্র্য-কদর্যের স্বাভাবিকতায় প্রকাশমান; বাস্তবের জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন; যার ছবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯), বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) 'কৃষক', দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) 'নীল দপর্ণ' (১৮৬০), মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'জমিদার দর্পণে' (১৮৭৩) অঙ্কিত। এককথায় বাংলার কৃষক আন্দোলনে উজ্জীবিত চৈতন্য কবির মাঝে ক্রিয়াশীল।

আল মাহমুদের কবিতায় কবিপুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একেবারে সরল বা দ্বিধামুক্ত নয়। গাঁয়ের ছেলে যখন অনিবার্য প্রতিকূলতা জয় করে নিজ গ্রামে ফিরে আসে, তখন 'শস্যের শিল্পীরা' অবাক হয়ে যায়। সে যে গাঁয়েরই সন্তান, সকলের লোক, তাঁর স্বজনের মেলে দেয়া বিচালিতে বসতে লজ্জা থাকার কথা নয়। কিন্তু গাঁয়ের লোকের আন্তরিক আহ্বানে প্রত্যাগত পুরুষের বাধা আসে কৃত্রিম-নাগরিক পোষাকের কারণে। গ্রামীণ সংস্কৃতির বিপরীতে নয়া উপনিবেশবাদের (Colonialism) সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের জন্যে সে 'স্বজনের সাহচার্য' আর 'দেশের মাটির বুকে'র আত্মীয়তা থেকে বঞ্চিত। সে বন্দী 'নিভাঁজ পোষাকে'র 'এক নির্মম সেলাইয়ে'। কিন্তু প্রত্যাগত পুরুষকে এই প্রতিবন্ধকতা জয় করতেই হবে, এবং যে জনপদকে কবি নির্মাণ করেছেন আধুনিক মানচিত্রের অন্তরালবর্তী অনুপ্রেরণায়, সেখানে পৌঁছার জন্য একটা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্তরঙ্গভাবে। আপন কাব্যরীতির উৎস, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই জীবনাচরণ ও তার অন্তর্গত বিষয়গুলোকে ধারণ করতে চেয়েছেন নিবিড়ভাবে।[৮] এই জন্যেই কবি সকল অসহায়তা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করে স্বাপ্নিক জগৎ থেকে বাংলাদেশের বিশাল আঙিনায় ফিরে আসে আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায়।

তোমাকে বসতে হবে এখানেই
এই ঠাণ্ডা ধানের বাতাসে।
আদরে এগিয়ে দেওয়া হুঁকোটাতে সুখটান মেরে
তাদের জানাতে হবে কুহলি পাখির পিছু পিছু
কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরজ!
['খড়ের গম্বুজ', *সোনালী কাবিন*]

নিজস্ব আশ্রয়ে ফিরে এসে প্রত্যাগত যুবককে কৈফিয়ত দিতে হয় আপন স্বজনের কাছে নগর সভ্যতার প্রতীক যে নিভাঁজ পোষাক, ছদ্মবেশী কোকিল আর শকুন তাদের প্রতারণায় কীভাবে গ্রামীণ সভ্যতার প্রতীক 'সবুজ লতা' সে হারিয়ে এসেছে।

ছায়া ও পল্লবের ঘ্রাণহীন নগর থেকে অকৃত্রিম বিশাল বাংলাদেশে কবির প্রত্যাবর্তন তাই বিশেষ তাৎপর্যের দাবীদার। সমালোচকের ভাষায়, "প্রত্যাগত, কেননা, তিনি পরিণতির বিপর্যয় থেকে মুক্ত করেছেন নান্দনিকতার ধূসর লোকালয়কে এবং রক্ত মাংসের সুস্থ সজীবতায় আমাদের দ্বিধামুক্ত জীবননিষ্ঠ প্রজ্ঞাকে করে দিয়েছেন উন্মুক্ত, উদ্দাম ও প্রাণস্পন্দনময়"।[৯] স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে জীবনানন্দ দাশ এবং আল মাহমুদের বিখ্যাত "প্রত্যাবর্তনের লজ্জা" নামক কবিতাটি স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' কবিতায় আল মাহমুদ প্রত্যাবর্তনের জন্য লজ্জিত হননি মোটেই, বরং আনন্দিত। শেষ পর্যন্ত কবিও ট্রেনফেল করে ঘরে ফেরার আনন্দে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত লজ্জাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবার অঙ্গীকার করেন।

আল মাহমুদের সামগ্রিক কবি-ভাবনার মূল উৎস এখনে নিহিত। তিনি বাংলাদেশের কবি ও বাঙালি কবি। বাংলার আপামর জনসাধারণ, রূপ-রস-গন্ধময় বাংলার অপরূপ প্রকৃতি ও জীবনের দৈনন্দিন জীবনালেখ্যই তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। এদের মাঝে থেকেই আল মাহমুদ এক স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারি; প্রকৃত অর্থে এটিই তাঁর কবি-স্বভাবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আল মাহমুদ নদীভাঙনের মুখে বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার দৃশ্যাবলি গভীর দুঃখময়তায় চিত্রিত করেন এবং সেই দুঃখের দেশেই ফিরে আসেন। নদীভাঙনের ফলে মানুষ এখানে ধনী থেকে এক নিমেষেই নিঃস্ব হয়ে যায়, উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তর হয় এবং অস্তিত্বহীন হয়ে ছিন্নমূল হতে বাধ্য হয়। এতে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের মৃত্যু ঘটে। মানুষের জীবনে নদীর ভাঙনের ভয়াবহ বাস্তবতা তাঁর কবিতায় আলাদা একটা জায়গা করে নিয়েছে।

ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম?
হায়রে নদী খেয়েছে সবকিছু
জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম।
['এক নদী', *সোনালি কাবিন*]

অথচ দু'জনেই বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধিময় এক চিত্র মনে প্রাণে কামনা করেছেন। কিন্তু এই কামনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ যেখানে রোমান্টিক আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, আল মাহমুদ সেখানে রোমান্টিক বিষাদে পরিপূর্ণ। আর তাই আল মাহমুদের কবিকণ্ঠে বারবার একটি কান্নার সুর সোচ্চার হয়ে ওঠে; তাঁর সমস্ত কবিতায় একটি বেদনার ভাষা প্রাণ পেতে চায়।

তবে মাঝে মাঝে বাংলার হারানো অতীত ঐশ্বর্যের আক্ষেপে কবিকে বেশ উত্তেজিত এবং তেজী মনে হয়– কবি যা পেয়ে হারিয়েছেন তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য রীতিমত দ্রোহী হতে দেখা যায়।

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেলো শেষে
হেথায় খুঁজি হোতায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
... ... ...
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।
['*নোলক*', *পাখির কাছে ফুলের কাছে*]

কবি খালি হাতে ফিরতে চান না, হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এমন কি তিনি সেই ধন পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়ে ফিরতে রাজি নন। অর্থাৎ কবির ফিরে আসার সঙ্গে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন জড়িত। এখানেই কবি আলাদা হয়ে যান অন্যসব কবি থেকে।

স্বাদেশিকতার প্রশ্নে আল মাহমুদ জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদদীনের গ্রামীণ নিসর্গ, জনপদ ও জীবনকে দেখা ও আঁকার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেননি এবং গ্রামীণ বাংলায় তাদের পথে ফিরেও আসেননি। বরং তিনি জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান ও এসএম সুলতানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আল মাহমুদ এঁদের মতো কৃষকের উপস্থিতিকে বাস্তবতা দিয়েছেন। কৃষকেরা মৃত নয়, অতীতের একটা অংশ নয়, তারা বিদ্যমানতা এবং বর্তমানতার মধ্যে জীবন্ত। তাই তাঁর কৃষক আধুনিক ঐতিহ্যের অংশ, ঐতিহ্যের অবদমিত অংশ এবং অবদমিত অংশের উপস্থিতি। আল মাহমুদের মৌলিকতা এবং স্বাদেশিকতা সেই আবহমান বাংলায় ফেরার পিপাসায় এবং প্রত্যাবর্তনের লজ্জায়। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সকল সংকোচ, গ্লানি ও লজ্জার উর্ধ্বে। তাই তিনি গাঁয়েই ফিরে এসেছেন; গাঁয়ের জমিনে, নদীতে ও নিসর্গে।

আল মাহমুদের স্বদেশচেতনা তাঁর কবিতার সামগ্রিক রূপকল্পে বিরাজমান। তাঁর কবিতায় যে শব্দ, শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয় তা সরাসরি গ্রামীণ আবহ, সমাজ, সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে স্বদেশের প্রতিবিম্ব।

কাব্যযাত্রার সূচনাকাল থেকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় আল মাহমুদ স্বদেশচেতনায় অনুপ্রাণিত। এই বোধ থেকেই তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ও বাংলা কাব্যের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করেন। পুণ্ড্র, পাট্টিকেরা, গৌতম, শ্রীজ্ঞান, কাহ্নপা, অনার্য প্রাচীন, মহাস্থানগড়, মহালিঙ্গ, শীলভদ্র, মুকুন্দরাম, ব্যাধের আদিম সাজ[১০], আলাওল, রোসাঙ্গের অশ্ব, লালন,

বাউল, বেহুলা, মঙ্গলকুলোয় ধান্য ইত্যাদির সমন্বিত ধারা এসে অতীত ও বর্তানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। অতীতের বর্তমানতায় উজ্জীবিত কবি:

স্বদেশভূমি, তুমি, তোমার নাম
শুনেছিলাম মাংস থেকে মা'র
ফাটিয়ে দিয়ে শহর ঘর গ্রাম
আমরা কটি পুত্র কানু পা'র।
['শরীর থেকে মা'র', *কালের কলস*]

স্বদেশ ও জননী কবির কাছে এক ও অভিন্ন রেখায় উদ্ভাসিত। ফেব্রুয়ারির মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকার আদায় এবং সেই একই ধারায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার গভীর অন্বয় ও আত্মীয়তা বিশেষত্বপূর্ণ। অর্থাৎ দেশজননীর ধারণার বহিঃপ্রকাশে এই বোধ জারিত:

জানালায় মুখ রেখে চকিতে দেখলাম
উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে ওঠে কালের কল্লোর
আর সমস্ত রাজপথে ফেব্রুয়ারির নিঃশঙ্ক পাখির আওয়াজ
রক্তাভ ফুলের মতো আমার সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব।
বাঙালা... বাঙলা...
আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।
['নিদ্রিতা মায়ের নাম', *কালের কলস*]

আল মাহমুদের কবিতায় দুঃখময় স্বদেশের উপমা দুখী-অভাবী মায়ের সঙ্গে দিয়েছেন। দেশ আর মা উভয়ই কবির কাছে হারানো ঐশ্বর্যের বেদনায় বর্তমান। উভয় সত্তাই অভিন্ন দুঃখবোধে আক্রান্ত। ঐশ্বর্য বা সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্যে পুঁজির কেন্দ্র শহরগুলোকে অতর্কিতে দখল করা হবে কবির মুখে তার-ই 'রক্তাক্ত পরিকল্পনা' উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। ঐতিহ্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কবি আবার স্বদেশ খুঁজে পেয়েছেন অতীত ইতিহাসের মাঝে।

যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুণ্ড্রের নগর
মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।
আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাট্রিকেরা পুরীর গৌরব।
['সোনালি কাবিন: ৯', *সোনালি কাবিন*]

আল মাহমুদ বাংলার গ্রামজনপদের এবং গ্রামের মাটি-প্রান্তর-নদী-কৃষক সমাজে প্রত্যাবর্তনের ছবি যেমন একেঁছেন; অন্যদিকে বাংলার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যে স্বদেশের রূপ এবং গ্রামসমাজের বিপরীতে স্থাপিত নগরসভ্যতার প্রতি তীব্র আক্রমণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যে প্রত্যয়ের মাঝে আগামী দিনের স্বপ্নের স্বদেশ নির্মাণ করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।
['স্বপ্নের সানুদেশে', *সোনালি কাবিন*]

কবি গ্রামসভ্যতায় ফিরে এসেই ক্ষান্ত হননি; জীবনের সেই আশ্রয়কে বিনির্মাণের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন তৈরি করেন। কাঙ্ক্ষিত স্বদেশের মানচিত্র অঙ্কন, আগামী প্রজন্মসহ সেখানে বসবাস এবং বসবাসের অপরিহার্য শর্ত সৃষ্টির কল্পচিত্র তিনি আন্তরিক প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

আল মাহমুদ উপনিবেশের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক আঙ্গিকে স্বাদেশিকতার নিজস্ব কল্পচিত্র, মত ও পথ নির্মাণ করেন।

আল মাহমুদের কবিতায় স্বাদেশিক বোধ নিজ দেশের মৃত্তিকা, জল, হাওয়া, কৃষক, কৃষিব্যবস্থা, নদী-নৌকা-জেলে, পশুপাখি এবং মানুষ, মানুষের সমাজ, রাজনীতি, লোকসংস্কৃতি, অর্থনীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-শান্তি, সমকালীন বাস্তবতা থেকে উত্থিত। আবার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রে এই মনোভাব প্রকাশিত। উপনিবেশিক চিন্তা-চেতনার শৃঙ্খলের বাইরে এসে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সৃজন ও প্রকাশে তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

**খ**

শিক্ষাক্ষেত্রে আল মাহমুদের কবিতা পাঠদানে স্বাদেশিকতা প্রশ্নে কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়:

ক. ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশের প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টি থাকে সেখান থেকে আল মাহমুদের কবিতাপাঠে স্বদেশ ও স্বদেশের প্রকৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে হীনমন্যতা দূর হয়ে আত্মসচেতনতা ও গৌরব অনুভব করবে।

খ. আধুনিকতাবাদী বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে আল মাহমুদের কবিতা আবহমান বাংলার লোকজ আধুনিকতার শিক্ষা প্রদান করে।

গ. স্বদেশের রূপ-ঐশ্বর্যের রূপায়ণ এবং বঙ্গজননী রূপে স্বদেশকে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে দায়বদ্ধতার অনুভূতি জাগ্রত হবে।

সবমিলিয়ে ঋতুজ, রূপজ ও লোকজ আবহমান বাংলাকে কবি আল মাহমুদ কবিতার নিজস্ব ভাব ও ভাষায় প্রাণবন্ত করে তোলেন। তাঁর কবিতাপাঠে বাংলাদেশের নাগরিকদের মন ও মননে স্বাদেশিক বোধ, দায় ও ভালোবাসা জন্মাবে। সেইসাথে ঔপনিবেশিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত এবং বাংলাদেশ পন্থায় অগ্রসর হয়ে জীবন ও নন্দন দৃষ্টি সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে।

---

**তথ্য নির্দেশ**

১ আল মাহমুদ, *কবির সৃজনবেদনা* (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ৪৫।

২ *প্রাগুক্ত*, সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), *আল মাহমুদ: সাক্ষাৎকার* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ২৭-২৮।

৩ *প্রাগুক্ত*, 'ভূমিকা', *আল মাহমুদের কবিতা* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১), পৃ. ১।

৪ বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ* (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১২-১৩।

৫ আল মাহমুদ, *আল মাহমুদ: সাক্ষাৎকার*, পৃ. ১০৫।

৬ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর* (প্র. সং.; ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ১৩৫।

৭ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ*, পৃ. ১৬-১৭।

৮ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর*, পৃ. ১৪১।

৯ *তদেব*, পৃ. ১৪২।

১০ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, *আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৬০১-৬০২।